*Journal of Cultural Research Studies, Vol-III Issue-2(2024), p27-34. (*ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Open Access Journal

সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব সঙ্কট ও রাজবংশী সম্প্রদায়: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভুপেশ রায়
স্নাতকোত্তর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার:

সংস্কৃতি হল সমাজবদ্ধ মানুষের বিশেষ পরিচয়। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল যুগে ও সকল স্থানেই আমরা স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সন্ধান পাই। সংস্কৃতি হল মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যা কোনো একটি গোষ্ঠীর বা সমাজের জীবনধারার পরিচয় বাসক। স্থান,কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়। তেমনি ভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠী "রাজবংশী" সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। যা তাদের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে পৃথক করেছে। কিন্ত বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি,নগর সভ্যতার উত্থান, বিশ্বায়নের প্রভাব, বিভিন্ন সংস্কৃতির আদানপ্রদান, সংস্কৃতায়ন, সামাজিক গণমাধ্যম প্রভৃতির রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। এর ফলে তারা তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে ভুলে মূলধারার সংস্কৃতির বিভিন্ন রীতিনীতিকে আয়ত্ব করতে শুরু করেছে, যার ফল হিসেবে এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতির অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন। আলোচ্য এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটির মাধ্যমে রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও জীবনধারার কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং এর কারনগুলি কী কী তা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

সূচক শব্দ: রাজবংশী সম্প্রদায়, অস্তিত্ব সংকট, সাংস্কৃতিক সংকট, বিশ্বায়ন, সাংস্কৃতি পরিবর্তন

ভূমিকা:

রাজবংশী সম্প্রদায় হল উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান জনগোষ্ঠী।উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ,আলিপুরদুয়ার ,দুই দিনাজপুর ও মালদা , নিম্ন আসাম, নেপাল সহ বাংলাদেশের রংপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মূলত এই সম্প্রদায়ের বসবাস। ১৯২১ সালের জনগননা তথ্য অনুযায়ী ১৭২৭১১১ জন রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১৫৩০৭১২ অর্থাৎ ৮৬ শতাংশ রাজবংশী দিনাজপুর, রংপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই চারটি জেলায় বসবাস করে,তবে পরবর্তী কালে দেশভাগ,পরিব্রাজন সহ অন্যান্য কারনে উত্তরবঙ্গের এই জেলাগুলিতে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশী মানুষের অনুপ্রবেশের ফলে জনসংখ্যার অনুপাতের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।১৯৮১ সালের জনগননা তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের তপসিলি জাতির ১৯ শতাংশ ছিল রাজবংশী এবং উত্তরবঙ্গের মোট রাজবংশী জনসংখ্যার ৭৪ শতাংশ কোচবিহারে, ৩২ শতাংশ জলপাইগুড়িতে, ১৩ শতাংশ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে এবং ৮ শতাংশ দার্জিলিং ও মালদা জেলায় বসবাস করতো।এই রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা, খাদ্যাভ্যাস,পোষাক পরিচ্ছেদ সহ নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্যে ভরপুর। এই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর বিশেষ কিছু প্রথা ও জীবন প্রনালী এদের অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে। যা ভারতীয় সমাজের সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে।কিন্ত আজকের একবিংশ এই শতকে আধুনিক নগর

সভ্যতার উদ্ভব, বিশ্বায়ন, সংস্কৃতায়ন ও বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ প্রভৃতি কারণে রাজবংশী সম্প্রদায় তাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন। যার ফলে উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র এই সম্প্রদায় ক্রমশই তাদের সাংস্কৃতিক নিজস্বতা হারিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিনত হচ্ছে।বর্তমান প্রজন্মের রাজবংশী ছেলে মেয়েরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রভাবশালী বাঙালি ও অন্যান্য সংস্কৃতিকে অনুসরণ কথায় তারা ক্রমশ তাদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।অনেকে আবার সামাজিক মাধ্যম ও অন্যান্য স্থানে নিজেকে বাঙালি হিসেবেই তুলে ধরছে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে বলতে গেলে রাজবংশী সম্প্রদায় তাদের পূর্বের গৌরবময় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজ ক্রমেই অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন। এই জনগোষ্ঠীর সামাজিক রীতিনীতি,ভাষা,প্রথা,বিনোদন, খাদ্যাভ্যাস,বিবাহ ব্যবস্থা,পারিবারিক কাঠামো, পেশা, অর্থনীতি সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক দিকগুলি আজ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করে চলেছে।আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে কোনো সংস্কৃতিই প্রভাবশালী মূলধারার বিশ্ব সংস্কৃতির আগ্রসন থেকে মুক্ত নয়। বিশেষত প্রান্তিক ছোট ছোট সম্প্রদায় ও উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সংস্কৃতি এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এতে সামাজিক গণমাধ্যম খুবই গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে ।দেখা যায় গণমাধ্যম সবসময় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করে এবং সুকৌশল ভাবে ভাবে মূলধারার প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে সকলের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব সংকটের জন্য এই সমস্ত কারণকে কোনো ভাবেই অস্বীকার করা যায়।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটিতে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উভয় প্রকার তথ্যই ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও বেশিরভাগ তথ্য সেকেন্ডারি তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে কিছু রাজবংশী গুনি মানুষের সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং সেকেন্ডারি তথ্যের উৎস হিসেবে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী জার্নাল, বই, ইন্টারনেট এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষাগত অস্তিত্ব সংকট:

যে কোনো জাতির ভাষা হল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।কোনো একটি জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এবং সেই গোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ রাখতে ভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলি এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও একই কথা প্রযোজ্য ।রাজবংশী সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ভাষা "রাজবংশী" বা "কামতাপুরী" ভাষায় কথা বলেন।শুধু যে হিন্দু রাজবংশীরা এই ভাষায় কথা বলেন তা কিন্ত নয় উত্তরবঙ্গের প্রধান মুসলিম গোষ্ঠী 'নস্য শেখ' সম্প্রদায়ও এই ‘রাজবংশী’ বা ‘কামতাপুরি’ ভাষায় কথা বলেন।অনেকেই এই ভাষাটিকে বাংলার উপভাষা হিসেবে মনে করলেও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষরা মনে করেন এই ভাষা তাদের নিজস্ব ভাষা।সম্প্রতিক কালে বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. ধর্মনারায়ন বর্মা তাঁর “কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপরেখা” শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থে দাবী করেন যে এই ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এই ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদান করে ২০১২ সালে ‘রাজবংশী ভাষা একাদেমি’ গঠন করেছে। তবে পরবর্তীকালে এই ভাষার নামকরণের বিতর্ককে কেন্দ্র করে একই ভাষার ‘কামতাপুরী ভাষা একাদেমি’ গঠন করা হয়,যা এই ভাষার সংকটকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কেননা একই ভাষার দুই নাম এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

সাম্প্রতিককালে ২০২০ সাল থেকে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্বাবধানে ১৯৮ টি রাজবংশী প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠন করা হয়েছে। কিন্ত এতো কিছুর পরেও বর্তমানে রাজবংশী ভাষা তার অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন ।বর্তমানে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যার তুলনায় রাজবংশী ভাষায় কথা বলার মানুষের সংখ্যা অনেকটাই কম।যা প্রমান করে সকল রাজবংশী মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন না। মূলত প্রতিযোগিতা মূলত পরীক্ষা তথা সরকারি কাজে এই ভাষার ব্যবহার না হওয়ায় শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত রাজবংশীরা তাদের সন্তানদের এই ভাষা শেখাতে আগ্রহী নন,বরং তারা বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দি ভাষাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়।এমন অনেক উদাহরণ আছে বিশেষত প্রতিষ্ঠিত শহুরে চাকরিজীবি যারা আগে গ্রামে রাজবংশী ভাষায় কথা বললেও এখন তাদের সন্তানদের এই ভাষায় কথা বললে দেন না।এমনকি গ্রামীন পরিবেশেও এমন একটি ধারনার সৃষ্টি হয়েছে যে বড়রা ছোটদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। তাই ধীরে ধীরে রাজবংশীদের কাছেই এই ভাষা ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। তাই বলা যায় এভাবে চলতে থাকলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই নিজস্ব ভাষা আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পাঞ্জা লড়বে। মূলত সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে রাজবংশী সম্প্রদায় আজ তাদের ভাষা সংস্কৃতিকে ভুলে বাঙালি ও অন্যান্য মূলধারার প্রভাবশালী ভাষা সংস্কৃতিকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে,যা এই ভাষার অস্তিত্বকে আরো সংকটের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন:

রাজবংশী সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব বিচিত্র খাদ্যাভ্যাসের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সহজসরল জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার ও খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে বিনোদন গভীরভাবে সংযুক্ত। এরা মূলত হিন্দু ধর্মকে অনুসরণ করলেও আদিবাসী সংস্কৃতির বহু উপাদান এদের জীবনযাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।রাজবংশীদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল সিদোল, ছ্যাকা-প্যাল্কা(অনেকে প্যাল্কা বলে), ফোক্তই, ঠাকুরি কালাইর ডাল (রাজবংশীরা মাসকালাইকে তাদের ভাষায় ঠাকুরি কালাই বলে) প্রভৃতি। 'সিদোল' মূলত তৈরি করা হয় মাছ থেকে।প্রথমে শুকনো মাছ, মান কচু, হলুদ, লংকা এগুলিকে একসঙ্গে ছামগাইনে ভালো করে মিশিয়ে তা রোদে শুকোতে হয়।এর পর শুকানো হয়ে গেলে তা সারাবছরের জন্য সংরক্ষণ করা হয় এবং সেটাকে খাওয়ার সময় পুড়িয়ে নিতে হয়।এই সিদোল নিয়ে অনেক গান-প্রবাদ রয়েছে-

"খুড়িয়া, বতুয়ার আগাল

ডিমার ভাজি, কৈতরের ছাও

নাউর পাতত করিয়া দে সিদোলের পাতাও"

অন্যদিকে ছ্যাকা-প্যাল্কা হল রাজবংশী সম্প্রদায়ের একটি নিজস্ব খাবার। ছ্যাঁকা হল মূলত এক ধরনের ক্ষার। এটাকে বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে রান্না করে খাওয়া হয়,যেমন সজনা পাতার ছ্যাকা, লাফা শাকের ছ্যাকা, বাধাঁকপির ছ্যাকা প্রভৃতি। এটা মূলত তৈরি করা হয় কলার গাছ ও এর মূল শেকরটিকে পুড়িয়ে।এই রাজবংশীদের কাছে এটি অত্যন্ত একটি প্রিয় খাবার, যা একেবারেই তাদের নিজস্ব মৌলিক একটি খাবার। এরা মূলত কৃষিজীবি হওয়ায় সারাবছর বাড়িতে গরুর দুধ দই থাকতো, যা এদের খুবই প্রিয়। কিছুদিন আগেও রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর মেলায় দই চিড়ে পাওয়া

যেত।বিশেষত কোচবিহারের রাসের মেলা,জলপাইগুড়ির জল্লেশ মেলায় প্রচুর দই চিড়ের দোকান বসতো। কিন্তু বর্তমানে আর তেমন দেখা যায় না।দু একটি দোকান থাকলেও বর্তমান প্রজন্ম বিদেশী খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির খাবারগুলির ভুলতে বসেছে।কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়ন সহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতির সংযুক্তি কারণের ফলে এরা এদের ঐতিহ্যগত খাদ্যাভ্যাস গুলিকে বর্তমানে ভুলতে বসেছে। বর্তমান রাজবংশী প্রজন্ম এই খাবারগুলি তেমন খায় না বললেই চলে।অন্যদিকে কৃষিকাজে কীটনাশক, বিষ এসবের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আজকাল দেশী মাছ তেমন পাওয়া না যাওয়ায় 'সিদোল' ও তেমন তৈরি করেন না। এমন অনেক রাজবংশীও রয়েছে যারা এখনো এই খাবারগুলো খাননি ,বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগ রাজবংশী রমনী তাদের ঐতিহ্যগত খাবারগুলি তৈরি করতে অপারগ। ফলে ক্রমশ রাজবংশীদের এই ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলি তাদের সংস্কৃতি থেকে খুব দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্ন ও রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব সংকট :

যে কোনো সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর সমাজ জীবনের কিছু না কিছু রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয় ।তেমনি রাজবংশী সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বিশেষ কিছু রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়, যা তাদের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র করে।এরা মূলত প্রকৃতি প্রেমী হওয়ায় এদের জীবন ধারায় প্রকৃতির সঙ্গে দৃঢ় বন্ধন দেখা যায়। "পান সুপারি" রাজবংশীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বাড়িতে কোনও অতিথি আসলে সবার প্রথমে ‘গুয়া পান’(পানসুপারি)দিয়েই আপ্পায়ন করে থাকেন। প্রতিটি রাজবংশী বাড়িতে আর কোনো গাছ থাকুক না থাকুর সুপারি গাছ থাকবেই।তবে রাজবংশী সম্প্রদায়ের পরিবেশবান্ধব গৃহ পরিকল্পনা এক অভিনব বিষয়। যা এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের অন্যতম নিদর্শন।প্রচলিত রাজবংশী প্রবাদে একটি গৃহকে তখনি আদর্শ গৃহ বলা হবে যখন সেটি,

"পূবে হাঁস

পশ্চিমে বাঁশ

উত্তরে গুয়া

দক্ষিনে ধুয়া”

-এই বিষয়টিকে অনুসরণ করে তৈরি হবে। গৃহের 'পুবে' অর্থাৎ পূর্ব দিকে জলাশয় থাকবে যেখানে হাঁস খেলা করবে।গৃহের পশ্চিম দিকে বাঁশ বাগান থাকবে, যা পড়ন্ত বেলার রোদকে প্রতিহত করবে। উত্তরদিকে ‘গুয়া’ অর্থাৎ সুপারি বাগান থাকবে এবং গৃহের দক্ষিন দিক ‘ধুয়া’ অর্থাৎ খোলামেলা থাকবে। মূলত এই সমস্ত বিষয়গুলিকে অনুসরণ করেই রাজবংশীরা বাস্তু পরিকল্পনা করে থাকেন।তাই কোনো রাজবংশী বাড়ি গেলেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়তো।কিন্তু বর্তমানে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি,বাস্তুজমির সংকট প্রভৃতি কারনে বর্তমান রাজবংশী নব প্রজন্ম গৃহ তৈরির সময় এই রীতিনীতি অনুসরণ করে না বললেই চলে।রাজবংশী সম্প্রদায় বছরের প্রথম ধান রোপন করার আগে “গচুপুনা” নামে

একটি পূজা করতো ,কিন্তু সেটাও এখন আর তেমন দেখা যায় না বলেই চলে।বর্তমান প্রজন্ম এই বিষয়ে জানে না বললেই চলে।

"তেরেয়া পূজা" হল রাজবংশী সমাজের অন্যতম একটি রীতি। প্রতিবছর ১৩ ই ফাল্গুনের দিনটিতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা ঠান্ডা কে বিদায় জানানোর জন্য তেরেয়া পূজার আয়োজন করে থাকেন এবং এই পূজার পরিসমাপ্তি ঘটে পাড়ার সকল কে নিয়ে ভোজন এর মধ্য দিয়ে যা রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে "রাখাল সেবা" নামে পরিচিত। রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই পূজার মধ্য দিয়ে ঠান্ডা কে বিদায় জানিয়ে নতুন ঋতু কে স্বাগত জানানো হয়। তবে রাজবংশী সমাজের নতুন প্রজন্ম এখন তেমন ভাবে এই রীতিনীতি গুলি পালন করছে না,তাই অনেকে এবিষয়ে জানেই না।

পোষাকের পরিবর্তন:

রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মহিলাদের "পাটানি" হল অন্যতম পোষাক। অন্যদিকে পুরুষরা ধূতি, গামছা এসব পড়তো। তবে যাদের তেমন অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকতো না সেই সমস্ত পুরুষরা একধরনের ছোট কাপড়ের খন্ড পরতো, যেটাকে বলা হয় 'নেংটি' এবং মহিলারা বাড়িতে পরতো "ফোতা"। তবে বেশিরভাগ রাজবংশী মহিলারা বিভিন্ন ধরনের পাটানি পরতো।প্রায় ১২-১৪ রকমের পাটানি প্রচলন ছিল। পাটানি নিয়ে প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে,

"হাজার টাকার কুচুনি তাও পিন্দে পাটানি।" বর্তমানে বিয়ের ক্ষেত্রে যেমন বেনারসি শাড়ীর কদর,তেমনি রাজবংশী বিয়েতে "সৈস্যাফুলি" পাটানির কদর ছিল চোখে পড়ার মতো। এই পাটানি গুলো রাজবংশী মহিলারা বাড়িতেই তৈরি করতো।কিন্তু ধীরে ধীরে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তাদের ঐতিহ্যগত এই পোষাকগুলি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, এরা আধুনিক কালের দোকান, শপিং মলে প্রচলিত পোষাক এসবই পরে।আধুনিক রাজবংশী প্রজন্মের ছেলেরা প্যান্ট-শার্ট,কুর্তা,পাঞ্জাবী প্রভৃতি এবং মেয়রা কুর্তি ,চুড়িদার, ফ্রক, শাড়ি প্রভৃতি প্রচলিত পোষাক ব্যবহার করেন। তাই এখন পোষাক দেখে আর বোঝা যায় না কে রাজবংশী,কে বাঙালি।ফলে বলা যেতে পারে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোষাক পরিচ্ছদের প্রচলন এখন তেমন একটা নেই বললেই চলে। বর্তমান প্রজন্ম সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রী ,মডেল প্রভৃতি ফ্যাশন অনুসরণ করছে এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পোষাকের ধরন যুক্ত হয়েই চলেছে।তাই বিশেষত বিশ্বায়ন ও সোশ্যাল মিডিয়ার দাপটে বেশিরভাগ ছোট ছোট সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি আজ হুমকির সম্মুখীন।

বিবাহ ব্যবস্থার রীতিনীতির পরিবর্তন:

বিবাহ ব্যবস্থা রাজবংশী সম্প্রদায়ের খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এক দিক। হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিবাহের বেশিরভাগ নিয়ম ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের মতো হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিবাহের নিয়ম ও আচার আচরণ বাঙালি বা অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে যথেষ্ট আলাদা।এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু রীতিনীতি পরিলক্ষিত হয়। 'পানিছিটা বাপ','মিস্তর ধরা' রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিবাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।বিবাহের সময় কোনো এক দম্পতির বর ও কনের মাথায় জল ছিটিয়ে দেয়, যারা পানিছিটা বাপ ও পানি ছিটা মাও নামে পরিচিত। এই 'পানি ছিটা বাপ- মাও' নবদম্পতির নতুন সংসার গঠনে বাবা মায়ের মতোই অভিভাবকদের দায়িত্ব পালন করে।নব দম্পতি কোনো সমস্যায় পড়লে 'পানিছিটা

বাপ-মাও'এর শরণাপন্ন হলে তা তারা সমাধান করে দেন, সেটা আর্থিক দিক থেকে হোক বা অন্য কোনো দিক থেকে এবং তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আজীবন বজায় থাকে।কিন্ত বর্তমান দিনে ছেলে মেয়েরা নিজেদের পছন্দ মতো বিয়ে কথায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সমস্ত রীতিনীতি ঠিক ভাবে মানা হয় না। রাজবংশী সমাজের বিবাহের অন্যতম আর একটি রীতি হল "মিস্তর ধরা"। একটা সময় রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিবাহের সময় "মিস্তর ধরা" ছিল বাধ্যতামূলক একটি বিষয়। এক্ষেত্রে বিবাহের সময় কোনো একজন কাছের বন্ধুর সঙ্গে সামাজিক ভাবে বিবাহ মন্ডবে পুরোহিতের উপস্থিতিতে মিত্রতা স্থাপন করতে হতো,যাকে "মিস্তর ধরা" বলে এবং মিস্তরের স্ত্রীকে "মিস্তিরানী " বলে। বিয়ের সময় স্থাপন করা এই বন্ধুত্ব আত্মীয়তার এক অন্যতম নিদর্শন,এর ফলে দুই পরিবারের মধ্যে এক দৃঢ় আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে।বর্তমানে আধুনিক মন্ডপ ও সাজসজ্জা করে বিয়ের প্রচলন রাজবংশীদের ক্ষেত্রে ছিল না,শুধুমাত্র চারটি কলাগাছকে মাটিতে পুতে সেখানেই বিবাহের আসর বসতো। বর্তমানে রাজবংশী সমাজের বিয়েতে বর পক্ষকে পণ দেওয়ার প্রচলন দেখা গেলেও অতীতে রাজবংশী সমাজে কন্যাপক্ষকেই পণ দিতে হতো,অনেক পুরুষ এই পনের টাকা যোগার করতে না পেরে বিয়ে করতে পারতে পারতেন না। এই পুরুষ গুলি অনেকসময় বিয়ে করার জন্য কোনো মেয়ের বাড়িতে কাজের বিনিময়ে ঘর জামাই হিসেবে থাকতেন, এই ধরনের বিবাহকে বলা হল 'ঘর জিয়া' বিবাহ। তবে বর্তমানে রাজবংশী সমাজের বিবাহ ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, আগের বিবাহের যে সমস্ত রীতিনীতি ছিল তা এখন মেনে চলা হয় না বললেই চলে বরং বর্ণ হিন্দু সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি রাজবংশী বিবাহে যুক্ত হয়েছে।

সাংস্কৃতি চর্চা ও বিনোদনের পরিবর্তন:

রাজবংশী সম্প্রদায় বরাবরই গান বাজনা তথা বিনোদন প্রিয়। গান,নাটক, পালাটিয়া গান ,চোর-চুন্নির গান, বিষহরা গান প্রভৃতি রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিনোদন অন্যতম ক্ষেত্র। এই জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রানের গান "ভাওয়াইয়া" উত্তরবঙ্গের গর্ব। এই গানের মাধ্যমেই এদের জীবনধারার অর্থনীতি, সামাজিক রীতিনীতি, সুখ-দুঃখ ফুটে ওঠে। এই ভাওয়াইয়া দুই ভাগে বিভক্ত; 'দরিয়া' ও 'চটকা'। দরিয়া বলতে দুঃখমূলক গানকে এবং 'চটকা' বলতে আনন্দ মূলক গানকে নির্দেশ করে ।কুশান গান ও নৃত্যও খুবই জনপ্রিয়, যা রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর ওপর নির্মিত। "মেচেনি গান" হল এই সম্প্রদায়ের অন্যতম একটি দিক, প্রকৃতি প্রেমিক এই সম্প্রদায়ের কাছে উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী তিস্তাবুড়ি 'তিস্তাবুড়ি মা' হিসেবে পূজীত হন। এবং এই তিস্তাবুড়ি পূজোকে কেন্দ্র করে রাজবংশী ভাষায় যে গানগুলি বলা হয় তা 'মেচেনি গান' নামে পরিচিত। এই গানগুলি বংশ পরম্পরায় চলে আসলেও বর্তমান প্রজন্মের রাজবংশী মেয়েরা তেমনভাবে আগ্রহী নয়,ফলে ধীরে ধীরে এই গানগুলি রাজবংশী সমাজ থেকে বিলুপ্তির পথে,অল্প কিছুজন রয়েছে যারা এখনো এগুলিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আগে ধনী প্রায় প্রতিটি রাজবংশী বাড়িতেই গানবাজনা করা ও আড্ডা দেওয়া জন্য বাড়ির বাইরে একটি ঘর থাকতো,একে বলা হত ডারি ঘর। তবে এখন রাজবংশীদের সেইসব অতীত গৌরব নেই বললেই চলে।মানুষের কর্মব্যস্ততা যত বাড়ছে ততই এসবই উপাদান রাজবংশী মানুষদের জীবন ধারা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। কয়েক দশক আগেও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কাছে সংস্কৃতির বিভিন্ন পালাটিয়া নাটক, চোর চুন্নির গান,ভাওয়াইয়া সংগীত অনুষ্ঠান এসবই ছিল বিনোদনের অন্যতম দিক। কিন্ত আধুনিকতার দাপটে নব প্রজন্ম এখন আধুনিক হিন্দি-

বাংলা গান, সিনেমা, অর্কেস্ট্রা এসবের প্রতি বেশি আগ্রহী। তাই তাদের সাংস্কৃতিক এই দিকগুলি ক্রমশ জনমানস থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

উপসংহার:

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারনা হল 'সামাজিক পরিবর্তন'।আজকে বর্তমানে আমরা যে ধরনের সমাজে বসবাস করছি, যে ধরনের সাংস্কৃতিক রীতিনীতিগুলি অনুসরণ করছি তা কিন্ত সামাজিক পরিবর্তন প্রকিয়ার মাধ্যমেই এসেছে। এটি একটি বিশ্বব্যাপি প্রক্রিয়া ,এমন কোনও জাতিগোষ্ঠী বা সমাজ নেই যে সমাজের পরিবর্তন ঘটেনি। সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান সময় অব্দি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তেমন আজকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে তা সমাজবিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যেই পড়ে। বিশেষত আজকের একবিংশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি, মানুষের পেশাগত পরিবর্তন,বিশ্বায়ন, সামাজিক গণমাধ্যমের সহজলভ্যতা প্রভৃতি কারনে আধুনিক গণমাধ্যমের ও সমাজ মাধ্যমের প্রভাব, বিশ্বায়ন, বিভিন্ন দেশের মধ্যে উদারনীতিকরনের ফলে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান প্রভৃতি কারনে এই পরিবর্তন গুলো এতো দ্রুত ঘটছে যে ছোট ছোট জনগোষ্ঠীরগুলি তাদের সাংস্কৃতিক নিজস্বতা আর ধরে রাখতে পারছে না। অন্যদিকে মানুষ শিক্ষা,মানুষের কর্মসংস্থান সহ অন্যান্য কারণে দেশের তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করে ফলে প্রতিনিয়ত এক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে অপর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির আদান প্রদানের ঘটেই চলেছে, এক্ষেত্রে assimilation, acculturation প্রক্রিয়া গুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত প্রভাব থেকে রাজবংশী সম্প্রদায়ও বাদ যায়নি। ফলে তাদের পূর্বের যে সাংস্কৃতিক গরিমা ছিল তা এখন অনেটাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে যা তাদের সাংস্কৃতিক ভাবে অস্তিত্ব সংকটের হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

এই বিষয়টিকে আমরা বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী থিওডোর অ্যাডোর্নো ও হর্কহেইমার এর "সাংস্কৃতিক শিল্প (Cultural Industry)" ধারনাটির মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করতে পারি। তারা তাদের এই ধারনায় বলেছেন যে পুঁজিবাদি সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা অন্যান্য শিল্পপন্যের মতোই আমার-আপনার সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়কে (রীতিনীতি, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক, বিনোদন,ভাষা ইত্যাদি) পন্যে পরিনত করে মুনাফা অর্জন করে এবং আমাদের মধ্যে এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারনা তৈরি করে যে তাদের উৎপাদিত পন্যগুলি ছাড়া বর্তমান সমাজে আমরা যেন বেমানান! বাংলার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যায় দুর্গাপুজো, জামাইষ্ঠী ,ভাইফোটা প্রভৃতি বাঙালি সংস্কৃতিকেই বেশিরভাগ গণমাধ্যম তুলে ধরার চেষ্টা করে ,অন্যদিকে আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক সংস্কৃতিকে নিয়ে মূলধারার সমাজে তেমন চর্চা হয় না বললেই চলে।যার ফল স্বরূপ মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলির সংস্কৃতি আজ অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন। তবে পরিশেষে বলা যেতে পারে যে বর্তমান এই বিশ্বায়নের যুগে প্রায় সমস্ত ছোট ছোট সংস্কৃতিগুলি প্রভাবশালী মূলধারার সংস্কৃতির আগ্রসনের শিকার,যা গোটা বিশ্বকে ক্রমশ একক সংস্কৃতির একটি বিশ্ব হিসেবে পরিনত করছে। তবে ছোট ছোট এই সংস্কৃতির গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ,তাই সরকারকে এই প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীগুলির সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে ,সংকটজনক এই সংস্কৃতিগুলিকে রক্ষার জন্য সংস্কৃতি রক্ষক মন্ত্রণালয় স্থাপন করা দরকার। পাশাপশি সেই জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে তাদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তবে আমাদের ভারতবর্ষের মতো বহু জাতিগোষ্ঠী ও বৈচিত্র্যপূর্ন সাংস্কৃতি সম্পন্ন দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য কে রক্ষা করার জন্য ছোট ছোট

জনগোষ্ঠীরগুলির সাংস্কৃতি সংরক্ষণে সরকার তথা সেই গোষ্ঠীর সদস্যদের আন্তরিক ভাবে সদা সচেষ্ট থাকা দরকার। না হলে অদূর ভবিষ্যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মতো অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর গুলি হারিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র:

1. Census of India. (1921). *Census of India, 1921, Vol. 5, Part I, p. 358*. Government of India.

2. Bhawal, P. (2015). Evolution of Rajbanshi society: A Historical Assessment. *Journal of Humanities and Social Science, 20*(1), 56–61.

3. অনিল রায়ের সাক্ষাৎকার।

4. Barman, S. (2024). Rajbongshi Society and Culture of Cooch Behar on the Path of Change: A Sociological Analysis. *AGPE The Royal Gondwana Research Journal, 3*(1), 40–48.

5. রায়, জে.। (2016)। *রাজবংশী সমাজের খাদ্য সম্ভারের বৈচিত্রতা,* রাজবংশী সমাজ দর্পণ, (পৃ. ৫৫-৬০)। কলকাতা: দি সী বুক এজেন্সি।

6. মহাপাত্র, অ। (২০১৭)। *সংস্কৃতি ও সভ্যতা,বিষয় সমাজতত্ত্ব প্রত্যয় প্রতিষ্ঠান,* (পৃ. ৪৪৫-৪৫০)। কলকাতা: সুহৃদ পাবলিকেশন।

7. সান্যাল, চা. চ। (২০১৭)। *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী,* (পৃ. ২৭০-২৭৫)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

8. Debnath, S. (2016). *The Koch-Rajbanshis from Panchanan to Greater Cooch Behar Movement* (pp. 59–78). New Delhi: Aayu Publications.

9. Halder, T. K. (2014). Disarray in Koch-Rajbanshi identity and government approach: A Case Study of the Koch-Rajbanshi People. *International Journal of Current Research, 6* (10), 9329–9332.

10. Basu, S. (2003). *Dynamics of Caste Movement: The Rajbanshis of North Bengal*. New Delhi.